বিবেকানন্দ দু-মুখো ছুরি

বিনয়কুমার সরকার

■ বিবেকানন্দের দিগ্বিজয় ■

বিবেকানন্দ-পূজা দুনিয়ায় বাড়িয়া চলিয়াছে। বিবেকানন্দের দিগ্বিজয় এতদিন প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবদ্ধ ছিল। বৎসরখানেক হইল দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা দেশে প্রচারকার্যে গিয়াছেন স্বামী বিজয়ানন্দ। সেদেশের লোকেরা এখানকার বেলুড় মঠের সঙ্গে চিঠিপত্র চালাইয়া খরচপত্র দিয়া বাঙালি প্রচারককে লইয়া গিয়াছে। সেদেশে বিজয়ানন্দকে কথাবার্তা বলিতে হয় স্প্যানিস ভাষায়। পয়সা খরচ করে ওরা, গুরুগিরি করি আমরা। ইহার নাম যুবক বাংলা। জয় বিবেকানন্দের জয়।

মাস চারেক হইল জার্মানির ভীজবাডেন শহরের এক দর্শনকেন্দ্র হইতে নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। বেলুড় মঠ হইতে স্বামী যতীশ্বরানন্দকে পাঠানো হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে, আজকালকার জার্মানি হিটলারি জার্মানি। হিটলার-শাসিত জার্মান সমাজেও হিন্দুদর্শনের ডাক পড়িয়াছে। বাঙালি দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারককে হিটলারি জার্মানি গুরুর পদে বসাইয়াছে। যে জার্মান নরনারী হিটলারি আইন-কানুনের প্রভাবে ইহুদি এবং অন্যান্য বিজাতীয় নরনারীর সঙ্গে আত্মিক সংস্রব বর্জন করিতেছে, সেই জার্মান নরনারীই ভারতসন্তানকে সাধিয়া ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে। সেকালের ভারতধর্ম আর একালের বঙ্গদর্শন দুই-ই বিবেকানন্দ-শিষ্যের মারফত জার্মানিতে প্রচারিত হইতেছে। স্বামী যতীশ্বরানন্দ লিখিয়াছেন যে, জার্মান সমাজে ভারতীয় ও বাঙালি দর্শনের পশার বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। হয়তো তাঁহাকে জার্মানিতে বেশিদিন থাকিতে হইবে। জার্মান সমাজে বিবেকানন্দের নামে প্রতিষ্ঠিত জার্মান-কেন্দ্র এই প্রথম।

বিবেকানন্দের লেখালেখির ভিতর গোরু হারাইলেও ঢুঁড়িয়া পাওয়া যায়। বিবেকানন্দ-সাহিত্য এক বিপুল বিশ্বকোষ, ঠিক একখানা মহাভারত আর কি! কাজেই যার যখন যেমন খেয়াল সে তখন বিবেকানন্দের নিকট হইতে সেইরূপ পাঁতি বাহির করিয়া লয়। কখনো কখনো বিবেকানন্দ আমার চিন্তায় ফরাসি নেপোলিয়ানের জুড়িদার। বিবেকানন্দকে আমি ইংরেজ কার্লাইল সমঝিয়াও থাকি। আবার জার্মান-ইহুদি নিৎশ-এর সঙ্গে বিবেকানন্দকে এক আসনে বসানো আমার খেয়ালে দেখা গিয়াছে। মার্কিন হুইটম্যান অথবা ইংরেজ ব্রাউনিং ইত্যাদির সঙ্গে বিবেকানন্দের তুলনা করিয়া আমার আত্মা মাঝে মাঝে আনন্দ পাইয়া থাকে। অধিকন্তু, একালের জার্মান যৌবনাবতার হিটলারকে বিবেকানন্দী আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর বিবেচনা করাও আমার দস্তুর। তাহা ছাড়া বিবেকানন্দকে সেকেলে বৌদ্ধ বীরদের রাহুল-উপালি-মহাকচ্চায়ন ইত্যাদির সমকক্ষ সমঝিতেও আমি অভ্যস্ত।

আজ বিবেকানন্দের বিশ্বকোষ হাঁটকাইয়া এই দিগ্বিজয়ী বাঙালি বীরের কয়েকটা জীবন-মন্ত্র বাহির করিব। মন্তরগুলা হয়তো বা কোন বকাবকির ভিতর পাওয়া যাইবে, হয়তো বা কোন প্রবন্ধের ভিতর পাওয়া যাইবে, হয়তো বা কোন মোলাকাতের ভিতর পাওয়া যাইবে। আর যদি বিবেকানন্দী বিশ্বকোষের ছাপা হরফে এইসকল বিবেকানন্দ-বাণী সশরীরে ঢুঁড়িয়া পাওয়া না যায়, তাহা হইলে হয়তো সেইসব পাওয়া যাইবে বিবেকানন্দ মানুষটার ভিতর। কথাগুলা বিবেকানন্দ-নীতির অ, আ, ক, খ বিশেষ।

■ বাপের বেটা হোস তো একে একে লড়ে যা ■

বিবেকানন্দ দু-মুখো ছুরি। এই ছুরির কোন মুখই ভোঁতা নয়। দুই-ই চকচকে, ধারালো, জোরালো—যাকে আমাদের বিক্রমপুরে বলে 'চোখা'। বিবেকানন্দ 'মিছরির ছুরি' নয়। এই ছুরি বিলকুল তেতো, বিষাক্ত। বিবেকানন্দ জবর বিষ, জবর যম—কোন কোন লোকের পক্ষে, কোন কোন দলের পক্ষে, কোন কোন চিন্তাপ্রণালীর পক্ষে, কোন কোন কার্য-প্রণালীর পক্ষে। বিবেকানন্দের ব্যবসা—দুনিয়াকে লড়াইয়ে ডাকা, আহাম্মুকদের বেয়াকুবিগুলাকে কুচিকুচি করিয়া কাটা আর কাপুরুষদের মেজাজ ও হাত-পাকে গুঁড়া করিয়া ফেলা।

ইউরোপ-আমেরিকার দিকে, খ্রিস্টানদের দিকে, সাদা-চামড়াওয়ালা নরনারীর দিকে, 'পশ্চিমা'দের দিকে বিবেকানন্দের এক মুখ। অপর মুখ পুবের দিকে, এশিয়ার দিকে, ভারতের দিকে আর বিশেষ করিয়া আমাদের বাংলার

দিকে। পশ্চিমমুখো বিবেকানন্দ আর পুবমুখো বিবেকানন্দ —দুই বিবেকানন্দই জবরদস্ত শক্তিযোগী, দুই বিবেকানন্দই লড়াইয়ের পাঁয়তাড়া ঢুঁড়িতে অভ্যস্ত।

পশ্চিমাদের দিকে তাকাইয়া বিবেকানন্দ বলে—'আরে ভাই মার্কিন, আরে ভাই ইয়াঙ্কি! বাপের বেটা হোস তো একে একে লড়ে যা।' আমেরিকানরা জিজ্ঞাসা করিতেছে —'আরে বিবেকানন্দ, কি হলো ছাই, ভাল করে বুঝিয়ে বল।' বিবেকানন্দের জবাব নিম্নরূপ—'দ্যাখ আমেরিকান নরনারী, তোদের লম্ফঝম্ফ এত বেশি কেন জানিস? তোদের টাকা আছে, তোদের বাড়িঘর আছে, তোদের ব্যবসা আছে, তোদের ব্যাঙ্ক আছে, তোদের জাহাজ আছে, তোদের ব্যাপারী আছে, তোদের কনসাল আছে, তোদের পল্টন আছে, তোদের এইধরনের কত কি আছে! তোরা যখন লম্বাচওড়া কথা বলিস, তখন তোদের পেছনে থাকে এতগুলা লোক, দল, সঙ্ঘ, দপ্তর, অর্থশক্তি, রাষ্ট্রশক্তি, সমরশক্তি। আর আমি বঙ্গচন্দ্র, গোলামের বাচ্চা। আমার না আছে পয়সা, না আছে নাম। আমাদের বাংলাদেশের লোককে জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝিতে পারিবি। বিবেকানন্দের নাম-গন্ধ পর্যন্ত কেহ জানে না। দু-আনা, চার আনা, দশ আনা কুড়াইয়া কেহ কেহ কোনমতে আমাকে তোদের মুল্লুকে পাঠাইয়া দিয়াছে। আমার জোর "কৌপীণবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।" কষ্টেসৃষ্টে সমুদ্রে সাঁতার কাটিয়া মার্কিন মুল্লুকে আসিয়া হাজির হইয়াছি। আমার পেছনে কেহ নাই। যদি থাকে তো ভগবান রামকৃষ্ণ। সেইজন্যই বলি, তোরা একজন একজন করিয়া এই ন্যাংটা বাঙালি বাচ্চার সঙ্গে লড়িয়া যা। দেখি তোদের কার কত মুরোদ।'

ইংরেজকেও বিবেকানন্দ বলে—'ভাই ইংরেজ, তোকেও জানি, বেশ জানি, ভালরকমই জানি। তোদের নিজের দেশে—বিলাতে যতগুলা বড় বড় ইস্কুল-কলেজ আছে তাতে তোদের ছেলেপিলেদের সঙ্গে আমাদের ছেলেপিলেরাও পড়ে। আমাদের বাঙালি বা অন্যান্য ভারতসন্তান যারা বিলাতি পাঠশালায় পড়িতে যায়, তাহারা সকলেই যে বাছা-বাছা ভাল ছেলে তা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কী দেখি? বাঙালি ছোকরারা, অন্যান্য ভারতীয় ছোকরারা তাদের কেহ কেহ তোদের যত সব পয়লা দরের ছেলে— তাদের অনেকেরই সমানে-সমানে চলে। বড় বড় পারিতোষিক, মেডেল, প্রশংসাপত্র ইত্যাদি যাকিছু তোদের মোড়লেরা সব-সে-সেরা ছেলেদেরকে দিতে অভ্যস্ত, তার অনেক কিছুই আমাদের ছোকরারা মাঝে মাঝে লুটিয়া আনিয়াছে ও আনিতেছে। কাজেই বলি, ভায়া হে, বাপের বেটা হোস তো একে একে লড়ে যা। তারপর এই যে ভারতখানা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত, তাহার ভিতরেই বা কী দেখি? যে-যে দপ্তরে, যে-যে কাজে, যে-যে ব্যবসায় আর যে-যে পেশায় বাঙালিরা আর অন্যান্য ভারতসন্তানেরা তোদেরই কায়েম করা আইনের ফলে কিছু কিছু ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা দেখাইবার সুযোগ পাইয়াছে, সেইসকল কর্মক্ষেত্রে ইহারা তোদের স্বজাতীয় লোকের চেয়ে ছোট দাঁড়ায় নাই। উকিল, ডাক্তার, ইস্কুল-মাস্টার, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, দপ্তরের ডিরেক্টর ইত্যাদি হিসাবে ইংরেজরা বাঙালি বাচ্চাকে অথবা অন্যান্য ভারতবাসীকে ডিঙাইয়া যাইতে পারে নাই। এই সকল কথা তোদেরই গেজেটে, তোদেরই খবরের কাগজে, তোদেরই পার্লামেন্টের দলিলে খোদা আছে। তাই বলছি, গভর্নমেন্টের মেজাজ ভুলিয়া, ফৌজ আর পল্টনী জাহাজের দেমাক ভুলিয়া, টাকাকড়ির গরম ভুলিয়া বাপের বেটা হোস তো একে একে লড়ে যা। দেখা যাউক, গভর্নমেন্টহীন, ফৌজহীন, ব্যাঙ্কহীন, টাইটেলহীন, পদবিহীন মামুলি ইংরেজরা বাঙালি বাচ্চার চেয়ে, অনামী অজ্ঞাতকুলশীল ডাল-ভাত-খাউয়া বঙ্গসন্তানের চেয়ে বড় কিনা।'

ফরাসিকে, ইতালিয়ানকে, জার্মানকে, দুনিয়ার সাদা-চামড়াওয়ালা সকল পশ্চিমা নরনারীকেই বিবেকানন্দ 'কলা' দেখাইতেছে। আর বলিতেছে—'বাপের বেটা হোস তো একে একে লড়ে যা। দেখা যাউক, কার কত মুরোদ, কার মগজে কতখানি ঘি, কার চরিত্রে কতখানি মনুষ্যত্ব।'

এই গেল পশ্চিমমুখো বিবেকানন্দ। দুনিয়ার লোক, বিশেষত পশ্চিমা নরনারী শুনিল আর ভাবিল—'তাই তো, এ যে বিপ্লব, দুনিয়ার যুগান্তর! সংসারের ছোট-বড় ইত্যাদি শ্রেণি সম্বন্ধে এই প্রণালীতেও চিন্তা করা সম্ভব?' পশ্চিমারা এইরূপ ভাবিল আর বলিল—'বিবেকানন্দ বাপকা বেটা। এশিয়ায় লোক পায়দা হইয়াছে। বঙ্গচন্দ্রও পারিবে শাসিতে, হাসিতে হাসিতে, সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে।'

■ বাঙালির আবার বাণী! ■

বাপকা বেটা বিবেকানন্দ, পশ্চিমা মেয়েপুরুষের চিত্তে যুগান্তর-সাধক বিবেকানন্দ, ইউরোপ-আমেরিকায় বিপ্লব-প্রবর্তক বিবেকানন্দ এইবার পুব-মুখো হইল, বাঙালি-মুখো হইল। বাঙালিরা জিজ্ঞাসা করিতেছে—'আরে ভাই

বিবেকানন্দ, বল তো ভাই, আমাদের কি বাণী?' বিবেকানন্দ জিজ্ঞাসা করিতেছে—'আরে পদা, কাদের বাণী শুনবি?' পদা, যদু, হরা, ইসমাইল, আবদুল সকলে একসঙ্গে বলিতেছে—'শুনতে চাই আমরা ভারতবাসীর বাণী, বাঙালির বাণী, আধুনিক বাংলার বাণী, বর্তমান ভারতের বাণী।' পুব-মুখো বিবেকানন্দ বলিতেছে—'বাঙালির আবার বাণী? বর্তমান ভারতের বাণী শুনতে চায়, বর্তমান বাংলার বাণী শুনতে চায়! ভারতবাসী তো ম্যাড়াকান্ত, বাঙালিরা তো গোরু। ম্যাড়াকান্তগুলা, গোরুগুলা আবার চায় বাণী ফলাতে! এরা তো ভ্যাঁভ্যাঁ, ম্যাঁম্যাঁ করে। এইসব নরনারীর আবার বাণী কি?'

পুব-মুখো বিবেকানন্দের মুখঝাড়া খাইয়া ভারতবাসীর আর বাঙালির তো চক্ষুস্থির! দেশের লোক ভাবিল—'ইহার নাম বিবেকানন্দ? এ তো চাবুক, এ তো জুতো!' বিশ্ববাসী বলিল—'ইহার নাম বিপ্লব, ইহার নাম যুগান্তর।'

বাঙালির মাথায় এতদিনে প্রবেশ করিল—'তাই তো, বাঙালির তবে সত্য-সত্যই কোন বাণী নাই।' ভারতবর্ষের অন্যান্য নরনারীও প্রথম ভাবিতে শুরু করিল—'তবে কি বাস্তবিকপক্ষে আমরা সকলেই গোরু, ম্যাড়াকান্ত? দুনিয়ায় বর্তমান ভারতের কোন ইজ্জৎ নাই?' বিবেকানন্দের জুতা খাইয়া ভারতসন্তান আর বিশেষত বঙ্গচন্দ্র চাঙ্গা হইয়া উঠিল। ভারতের যেসব লোক 'নিজের বিচারে' নিজেকে বড় বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত—তাহাদিগকে জুতাইয়া দুরস্ত করিল বিবেকানন্দ। দুনিয়ার বাটখারায় ফেলিলে আমাদের ভারতখানা যে আহাম্মুকের বাথান আর কাপুরুষের চিড়িয়াখানা ছাড়া আর কিছুই নয়—এই বাণী যেই বাঙালির, মান্দ্রাজির, মারাঠার আর পাঞ্জাবির কানে ঢুকিল, তৎক্ষণাৎ ইহাদের নাকে তেল দিয়া ঘুমাইবার রেওয়াজ কাটিতে শুরু করিল। যুবক বাংলার জন্ম হইল, জগতে যুবক ভারত দেখা দিল।

■ মারে জুতা, খায় পূজা ■

বাংলাদেশে আর গোটা ভারতে যুগের পর যুগ ধরিয়া অনেক বড় লোকের জন্ম হইয়াছে। কিন্তু দেশের লোককে বিবেকানন্দের মতন জুতাইতে পারে নাই আর কেহ। বরং আমাদের দেশে যে যখন নতুন কথা বলিয়াছে, সে তখন দেশের লোকের হাতে মার খাইয়াছে। নতুন একটা কাজের প্রস্তাবে আমাদের দেশের লোক কোন সমাজ-সংস্কারককে বা স্বদেশ-সেবককে বড় শীঘ্র তারিফ করে নাই। জনসাধারণের মার খায় নাই—এমন করিতকর্মা বা চিন্তাশীল লোক বাংলাদেশে ছিল কিনা সন্দেহ। বিবেকানন্দের কপাল ভাল। বিবেকানন্দ মুখ-ঝাড়া ছাড়া আর কিছু জানে না। তার বচন মাত্রই তীব্র কষাঘাত। প্রতি মুহূর্ত দেশের লোককে গাল দেওয়া, তিরস্কার করা, চাবুক লাগানো আর জুতাইয়া লম্বা করা—এই ছিল বিবেকানন্দের দস্তুর। মজার কথা, দেশের লোক বিবেকানন্দের জুতা যত খাইয়াছে, ততই তাহাকে আরো বেশি সম্মান করিয়াছে, ভাল বাসিয়াছে, পূজা করিয়াছে। মারিয়াছে জুতা আর খাইয়াছে পূজা—এই হইল বাঙালি-মুখো বিবেকানন্দের চরিতকথা।

■ বিবেকানন্দের মক্কেল—কেরানি-ব্যাপারী-জমিদার ■

বিবেকানন্দকে লোকেরা এত ভালবাসিল কেন? দেখা যাউক বিবেকানন্দের মক্কেল কাহারা। মফস্‌সলের খবর যাহারা রাখে তাহারা জানে যে, রেলের কেরানি, স্টিমারের কেরানি, ডাকঘরের কেরানি, আদালতের কেরানি ইত্যাদি শ্রেণির লোকেরা বিবেকানন্দের ভক্ত। পাড়াগাঁয়ের ছোট-বড়-মাঝারি লাইব্রেরিতে যে দুশ-পাঁচশ বই আর খবরের কাগজ বা মাসিক পত্র থাকে, তাহার ভিতর গল্পের বইয়ের পরেই কাটে বিবেকানন্দের বইগুলা। আর বিবেকানন্দ-সাহিত্যের খাদকদের ভিতর বাঙালি মধ্যবিত্তের নানা শ্রেণি বেশ পুরু দল। আজকাল বাংলাদেশে হাজার খানেক গ্রন্থাগার চলিতেছে। তাহাদের কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসা করিলে বিবেকানন্দের বাজারটা বুঝিতে পারা যায়।

মফস্‌সলে আজকাল আরেক শ্রেণির মধ্যবিত্ত বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। তাহারা বিমার দালাল। গুনতিতে ইহারা হাজার কয়েক। অধিকন্তু সাড়ে সাতশ, আটশ বা হাজার 'কুটির ব্যাঙ্ক' (লোন অফিস) চলিতেছে। এই সমুদয়ে চাকরি করে বোধহয় হাজার তিন-চার। এই দুই শ্রেণির বণিকদের পরিবারে-পরিবারেও বিবেকানন্দের কাটতি খুব বেশি।

মধ্যবিত্তদের আরেক শ্রেণির লোক জমিদারের মুহুরি ও অন্যান্য কর্মচারী। ইহারা অনেকেই সাবেকপন্থী। সেকেলে ধরন-ধারণ ও মতিগতি, পাড়াগেঁয়ে চরিত্র ইত্যাদি এই সম্প্রদায়ের স্বভাবসিদ্ধ। এই সমাজে পড়াশুনার রেওয়াজ একটু-আধটু বাড়িতেছে। সেই রেওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর বচন, বক্তৃতা, মন্তর, উপদেশ ইত্যাদিও বাঙালি সমাজে শিকড় গাড়িতে শুরু করিয়াছে।

খবর লইয়া দেখিয়াছি যে, জমিদারেরাও বিবেকানন্দ-

সাহিত্যের মক্কেল। জমিদারেরা ডিস্পেন্সারি রাখিতে অভ্যস্ত। সেই সূত্রে দু-একজন ডাক্তার-কম্পাউন্ডারের সঙ্গে তাহাদের আনাগোনা স্বাভাবিক। ডাক্তার-কম্পাউন্ডারদের অনেকেই বিবেকানন্দের দু-একখানা বই বগলদাবা করিয়া চলিতে অভ্যস্ত, অথবা বালিশের নিচে রাখিয়া সংসার চালানো তাহাদের দস্তুর। জমিদারেরা এই সংসর্গে পড়িয়া বিবেকানন্দের মক্কেলে পরিণত হয়। জমিদারদের আরেক সহায় হইতেছে নিজ নিজ 'গার্জিয়েন টিউটর' বা মাস্টার মহাশয়। ইস্কুল প্রতিপালন করা বাঙালি জমিদার গৃহস্থালির একপ্রকার নিত্যকর্মপদ্ধতি-স্বরূপ। সুতরাং কয়েকজন ইস্কুলমাস্টারও জমিদারদের আবহাওয়ায় সর্বদাই থাকে। গার্জিয়েন টিউটর আর ইস্কুলমাস্টারদের বোধহয় কমসেকম চার আনা খাঁটি বিবেকানন্দ-ভক্ত। কাজেই বিবেকানন্দের পসার পরোক্ষভাবে জমিদারদের অন্দরমহল পর্যন্তও ধাওয়া করিতে পারিয়াছে। অধিকন্তু, ছোকরা উকিলদের সঙ্গেও জমিদারদের ভাব কম নয়! ছোকরা উকিল সম্প্রদায়ের অনেকেই বিবেকানন্দের গুণগ্রাহী। ফলত, জমিদারেরা নিজ ঘরোয়া লাইব্রেরিতে বই কিনিবার সময় 'বিবেকানন্দ এক সেট' অর্ডার দিতে ভুলে না।

অপরদিকে জমিদারেরা একালের ইঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, ব্যবসায়ী, বণিক ইত্যাদি শ্রেণির লোকের সঙ্গেও বন্ধুত্ব রাখে। অনেক জমিদারই আধুনিক শিল্প-বাণিজ্য শিখাইয়া আনিবার জন্য বাঙালি যুবাকে জাপানে, আমেরিকায়, জার্মানিতে পাঠাইবার কাজে অর্থসাহায্য করিয়াছে। স্বদেশি কারখানা চালাইবার জন্য চাঁদা দেওয়া অথবা শেয়ার কেনা ইত্যাদি কাজও জমিদারদের মামুলি স্বদেশ-সেবার অন্তর্গত। এইসকল কাজে যেসব যন্ত্রনিষ্ঠ, বিজ্ঞাননিষ্ঠ, বাণিজ্যনিষ্ঠ যুবা মোতায়েন—তাহাদের অনেকেই কখনো না কখনো দেশে-বিদেশে বিবেকানন্দ-কথা প্রচার করিয়া জীবন ধন্য করিয়াছে। ইহাদের মারফতেও জমিদারের আবহাওয়ায় বিবেকানন্দ-পূজা প্রসারিত হইয়াছে।

একালে যাহারা মজুর-আন্দোলন চালাইতেছে, তাহাদের বোধহয় প্রায় সকলেই বিবেকানন্দকে নিজ নিজ জীবন-প্রভাতে গুরু সমঝিতে অভ্যস্ত ছিল। আজও—'সোস্যালিজম্', 'কমিউনিজম্'-এর জোয়ার-কালেও—বিবেকানন্দ-পূজা মজুরপন্থীদের মহলে বেশ কিছু বজায় আছে। তাহা ছাড়া অন্যান্য 'ন্যাশনালিস্ট'-পন্থী স্বদেশ-সেবকরা তো বিবেকানন্দকে নিজেদের ভগীরথ বা পথ-প্রদর্শকরূপে চিরকালই পূজা করিয়া আসিতেছে। তাহার উপর আছে ছেলে-ছোকরাদের দল। আজকাল শ'এগার-বার ম্যাট্রিকুলেশন-ইস্কুলে পড়ে প্রায় পৌনে তিন লাখ ছেলেমেয়ে। ফিবছর পুরস্কার বিতরণের সময় তাহারা সকলেই অন্তত একবার বিবেকানন্দের 'মা আমায় মানুষ কর!' আওড়ানো শুনিতে অভ্যস্ত। আওড়ায় বটে দশ বৎসরের বাচ্চা, কিন্তু মাতে শত শত লোক—ছেলে-বুড়া, বাপ-মা, ইস্কুল-মাস্টার, ইস্কুলের সেক্রেটারি।

■ হাতের কাছের কর্তব্য বনাম কালী-কৃষ্ণ-শিব-ব্রহ্ম ■

কেরানিকে কেরানি, মুহুরিকে মুহুরি, ইস্কুল-মাস্টারকে ইস্কুল-মাস্টার, ইঞ্জিনিয়ারকে ইঞ্জিনিয়ার, বণিককে বণিক, ডাক্তারকে ডাক্তার, জমিদারকে জমিদার—দেখিতেছি বাঙালি সমাজের সকল শ্রেণির লোকই বিবেকানন্দ-ভক্ত। এত বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন আয়ের, বিভিন্ন বয়সের লোক বিবেকানন্দকে লইয়া মাতামাতি করে কেন? বিবেকানন্দের ভিতর এমন কি আছে যাহাতে পঁচিশ-ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকার আয়ের গৃহস্থ হইতে পাঁচহাজার-পতি, দশহাজার-পতি, লাখ-পতি পর্যন্ত সকলেই তাহাকে সমানভাবে পূজাযোগ্য সমঝিতে অভ্যস্ত? জবাব অতি সোজা। গরিব মানুষ, বড় মানুষ, মাঝারি মানুষ—সকলেই বিবেকানন্দের ছোঁয়ায় তাতিতে আরম্ভ করে। বিবেকানন্দের কথাগুলায় যেকোন মানুষেরই প্রাণ ছ্যাঁক করিয়া উঠে। যে শুইয়া আছে সে উঠিয়া বসে, যে বসিয়া আছে সে খাড়া হইয়া পড়ে, যে খাড়া আছে সে চলিতে থাকে, আর যে চলিতেছে সে দৌড়াইতে লাগিয়া যায়। ঠিক যেন ছোকরারা জোয়ান হয়, আর জোয়ানরা পালোয়ান হয়।

বিবেকানন্দের কাছে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বয়সের আর অবস্থার উপযোগী কর্তব্যের হদিশ পায়। সকলেই বুঝিতে পারে যে, তাহার নিজের একটা কিছু করিবার আছে। আর সেই কর্তব্যটা পাঁচ-সাত-দশ বৎসর বা পাঁচ-সাত-দশ জন্মের পর পালন করিলে চলিবে না। কর্তব্যটা এখনকার, এখানকার, এই মুহূর্তের, এই ক্ষেত্রের। প্রত্যেক কেরানি, মুহুরি, জমিদার, ডাক্তার, বণিক, ইস্কুল-মাস্টার, সমাজকর্মী, মজুর-নায়ক, স্বদেশ-সেবকের নিকট বিবেকানন্দ ব্যক্তিগত কর্তব্যের কথা বলে। বিবেকানন্দের বাণী সোজাসুজি সকলেরই নিজ নিজ কর্তব্যজ্ঞানে ঘা লাগায়।

রামপ্রসাদের মতন 'কালী বলে বস না ধ্যানে' প্রচার

করিতে গেলে বিবেকানন্দ একালের বাঙালি সমাজে ফেল মারিত। সকলেই বলিত—'আরে ভায়া, সেসব তো জানি ঠানদিদির মালশি গানে।' ''হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্'' আওড়াইলেও বিবেকানন্দের কক্ষে জুটিত না। এদিকে ব্রহ্মপূজার মন্তর দিলেই কি বিবেকানন্দের মক্কেল জুটিত বেশি? তাহারও সম্ভাবনা কম। ''শিবোঽহম্, শিবোঽহম্'' হরদম চালাইলেও কেরানি-বণিক-জমিদারের দল বিবেকানন্দের পূজায় সিধা জোগাইতে ভিড়িত না। এমনকি 'গীতা-নাম গীতা-নাম গীতা-নামৈব কেবলম্' অথবা বেদান্ত ছাড়া ''কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'' বুলিতেও একালের কলি গলিত না।

■ আটপৌরে জীবনে শক্তিদাতা বিবেকানন্দ ■

বিবেকানন্দের বকাবকির ভিতর কালী আছে, কৃষ্ণ আছে, শিব আছে, ব্রহ্ম আছে, গীতা আছে, উপনিষদ্ আছে, যোগ আছে, রামকৃষ্ণ আছে আর বেদান্ত তো আছেই। বিবেকানন্দী বিশ্বকোষে এইসব ধর্ম, দর্শন, নীতি, দেবদেবী, হরির লুট, পাঁঠাবলি, উপাসনা, প্রার্থনা, সাকার-পূজা, নিরাকার-পূজা, দরিদ্র-নারায়ণ, কাঙালি-ভোজন, তীর্থগমন ইত্যাদি কোন কিছুরই অভাব নাই। যার মাথায় ঘি থাকে সে অনেক কিছুই আলোচনা করিতে পারে। বিবেকানন্দের মগজ ঘিয়ে ভরা ছিল। কাজেই তাহার সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলির ভিতর আশমান-জোড়া আলোচনা আছে।

কিন্তু মুহুরি, বণিক, বিমার দালাল, ইস্কুল-মাস্টার, দোকানদার ইত্যাদি লোক ভগবানের 'সামীপ্য' লাভের লোভে মাতোয়ারা হয় নাই। ভগবানের সঙ্গে 'সাযুজ্য' পাইবার আশা বা আকাঙ্ক্ষা যে বাঙালি মধ্যবিত্ত বা ডাক্তার-বাবু কিংবা জমিদারদের ভিতর খুব বেশি, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণও নাই। লোকেরা চায় এমন কিছু, যাহাতে রোজের কাজে রোজ সাহায্য পাওয়া যায়। প্রতিদিনকার আটপৌরে জীবনে উৎসাহদাতা, মন্ত্রদাতা, শক্তিদাতা আবশ্যক হয় দুনিয়ার প্রত্যেক গৃহস্থের, প্রত্যেক নরনারীর।

এইরূপ শক্তিদাতাই বিবেকানন্দের মুখ-ঝাড়া। ভগবান কাহাকে বলে, আত্মা কাহাকে বলে—এইসব কথা জানা থাকিলে নিত্যকর্ম-পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া যায় না। পরকাল কি বস্তু, ইহকালের সঙ্গে পরকালের কি সম্বন্ধ—এই বিষয়ে মাথা জবররূপে খেলিলেও এই মুহূর্তের কর্তব্যপালন সম্বন্ধে আনাড়ি থাকা খুবই সম্ভব। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগাযোগ কায়েম করিবার হদিশ জানিয়া সংসারের কাজকর্ম বা গৃহস্থালি চালাইবার দর্শনে ফেল মারা বিশেষ কিছু নয়। এইসব চিজ বিবেকানন্দী বিশ্বকোষের বড় কথা, প্রধান কথা অথবা আসল কথা হইলে বিবেকানন্দের মুখ-ঝাড়া খাইবার জন্য কেহ লালায়িত হইত না।

এইসকল কথা অতি মামুলি। শুনিয়া শুনিয়া লোকের কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে, আর কপচাইয়া কপচাইয়া দাঁতে খিল লাগিয়াছে, আর জিহ্বা ভোঁতা মারিয়া গিয়াছে। এইসব শব্দের ভিতর বা পশ্চাতে বস্তু ঢুঁড়িয়া বাহির করা অতি কঠিন। এইসবের ভিতর জীবন কতটুকু আছে তাহার বিশ্লেষণও বড় সহজ নয়। জীবন-গঠনের পক্ষে এইসকল শব্দে কিছু মশলা পাওয়া যায় কিনা তাহার গবেষণা বেশকিছু জটিলতাপূর্ণ। বিবেকানন্দের বিশ্বকোষে সেই আলোচনা-বিশ্লেষণ-গবেষণা আছে সন্দেহ নাই। এইসব বিষয়ে বিবেকানন্দ নিজেই বড় ওস্তাদও বটে। কিন্তু এইসব গবেষণার পিছন পিছন ছুটিয়া বাঙালি কেরানি-জমিদার-ইস্কুল-মাস্টার হয়রান হয় নাই। যতই বেয়াকুব হউক, একালের বাঙালি জাত এত আহাম্মুক নয়।

■ নিরেট আত্মোন্নতির হদিশ ■

'যেই কৃষ্ণ সেই কালী'—এইধরনের সমন্বয় বিবেকানন্দের পূর্বে অনেকেই চালাইয়াছে। বিবেকানন্দের মাথায়ও এই সমন্বয় আসিয়াছে। তাহার উপর আসিয়াছে খ্রিস্টানে বৌদ্ধে হিন্দুতে মুসলমানে, পূর্বে পশ্চিমে নানা প্রকার সমন্বয়ের মুসাবিদা। কিন্তু দুনিয়াব্যাপী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-জোড়া, সর্বজাতি-সমন্বয়কারী হিতোপদেশ বা ধর্মপ্রচার যদি বিবেকানন্দের বকাবকির ভিতর প্রধান 'মুদ্দা' থাকিত—একটা আমাদের মালদহী বোল ঝাড়া গেল—তাহা হইলে কেরানিরা বলিত—'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। রামপ্রসাদের মালশিই আবার গাওয়া যাউক। অথবা বোষ্টম-বোষ্টমির তুলসীতলায় গিয়া নাচানাচিই বা করি না কেন? বিবেকানন্দ, তাহা হইলে তুমি চরে খাও বনে-জঙ্গলে, অথবা আবার আমেরিকায়।' ইস্কুল-মাস্টারেরা, বিমার দালালেরা আর ব্যাপারীরাও ঠিক এইরূপই বলিতে বাধ্য হইত। এইরূপ অলীক বিশ্বধর্মের হিড়িকে ভাসিয়া যাইবার উন্মাদনা এযুগের বাঙালি জানে না।

বিবেকানন্দ বলে—'দ্যাখ, তুই বোষ্টম, কি শৈব, কি তান্ত্রিক, কি ব্রাহ্ম, কি মুসলমান, কি খ্রিস্টান, কি আর কিছু, কি সব কিছু তাতে বয়ে গেল। তুই যাই হোস, তোকে সংসারে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য লড়াই করিতেই হইবে।

তোর জীবনকে উন্নত করিবার জন্য কতকগুলা কাজ করা আবশ্যক। সেই কাজগুলা তোকে এখনি করিতে হইবে। তুই যত বড় লোকই হোস না কেন, তোর কতকগুলা অভাব আছে। সেই অভাবগুলা তোকে পূরণ করিতে হইবে—এখনই। দায়িত্ব প্রত্যেকেরই নিজ নিজ। নিজের উন্নতিসাধনই জীবনের আসল কাজ। তোর জীবন ব্যক্তিগত জিনিস। তোর কর্তব্য বস্তুনিষ্ঠ নিরেট কাজ।'

জ্ঞানযোগী বিবেকানন্দ বাঙালি সমাজকে তর্কশাস্ত্রের কচকচানির ভিতর আনিয়া ফেলে নাই। ভক্তিযোগী বিবেকানন্দের পাল্লায় পড়িয়া বাংলার নরনারী একটা নয়া বৈষ্ণব আন্দোলনের ভক্তিবন্যায় ভাসিয়া যায় নাই। কিন্তু বাংলার নরনারী কর্মযোগী বিবেকানন্দের জুতা খাইয়া প্রতি মুহূর্তের ব্যক্তিগত কর্তব্যনিষ্ঠায় চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালি ছোঁড়া-বুড়ারা মানবজাতির ধর্ম, বিশ্বপ্রেম, সর্বজাতি-সমন্বয়ের নীতি ইত্যাদি বুলিতে না মজিয়া নিজ নিজ উন্নতিসাধন, নিজ নিজ হাতের কাছের কর্তব্যপালনে প্রস্তুত হইতে শিখিয়াছে। ধরা-ছোঁয়া যায় এমন নিরেট আত্মোন্নতির হদিশ দিতে পারিয়াছে বলিয়াই বিবেকানন্দ একালের বাঙালির যুগাবতার।

বিবেকানন্দের বাঙালি বলিতেছে—'মা, আমায় মানুষ কর!' বলিতেছে না—'মা, দুনিয়াকে মানুষ কর।' বলিতেছে না—'রামাকে মানুষ কর, শ্যামাকে মানুষ কর, খ্রিস্টানকে মানুষ কর, ইউরোপকে মানুষ কর, আমেরিকাকে মানুষ কর।' বলিতেছে—'আমাকে মানুষ কর।' বলিতেছে না—'আহাম্মুকগুলাকে মানুষ কর, কাপুরুষগুলাকে মানুষ কর।' বলিতেছে—'আমি আহাম্মুক, আমাকে মানুষ কর।' বলিতেছে—'আমি কাপুরুষ, আমাকে মানুষ কর।'

■ বিবেকানন্দী নীতির চার খুঁটা ■

বিবেকানন্দের মানুষ-গড়ার কল অতি সোজা। ইহার ভিতর আধিদৈবিক আর আধ্যাত্মিক বুজরুকি কিছুই নাই। ইহার পয়লা খুঁটা—'লাগা কুস্তি জোরসে।' বিবেকানন্দ বলিতেছে—'চাই হাতের জোর, চাই পায়ের জোর, চাই কোমরের জোর, চাই কবজার জোর। চেহারাটা দুরস্ত হইবা মাত্র তোর মনিব তোকে দেখিয়া সম্মান করিতে শিখিবে। সেলাম করিবে তোকে তোর অন্নদাতা। বুঝলি? আর তুইও প্রতিমুহূর্তেই মানুষের মতন জীবন চাখিয়া বেড়াইতে পারিবি।'

মানুষ-গড়ার দ্বিতীয় কথা—'খা দু-বেলা পেট ভরিয়া।' বিবেকানন্দ বলিতেছে—'আধপেটা-খাউয়া বাঙালি, একবেলা-খাউয়া ভারতবাসী, তোরা আবার বাণী চালাবি কি রে? লাগিয়া যা চাষে। লাগিয়া যা ব্যবসায়। লাগিয়া যা কুটিরশিল্পে। লাগিয়া যা ফ্যাক্টরিতে। যার যেমন সুযোগ, মুরদ বা মরজি! কর দেশের ধনবৃদ্ধি। খা দু-বেলা পেট ভরিয়া। তাহা হইলেই বুঝিবি সিন্ধুনীরে আর ভূধরশিখরে যাওয়া কিংবা গগনের গ্রহ তন্নতন্ন করিয়া স্বকার্যসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া কী চিজ! তাহা হইলেই দেখিবি যে, তোদেরও বাণী আছে আর সেই বাণী শুনিবার জন্য দুনিয়াও উদ্গ্রীব।'

তৃতীয় খুঁটা হইল লোকসেবা। বিবেকানন্দ বলিতেছে—'নিজের শরীরটা তো বেশ পাকাইয়া তুলিতেছিস। ভাল কথা। ডন কসরত করিতে করিতে নিজ স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হইতেছে বুঝিতেছিস। এইবার লাগিয়া যা তোর পাড়ার লোকের ভিতর ডন, কসরত, কবাডি, ফুটবল ইত্যাদি কায়েম করিতে। লাগিয়া যা দেশসুদ্ধ লোকের স্বাস্থ্যোন্নতির কাজে, অকালমৃত্যু নিবারণের কাজে। যাদের শরীর দুর্বল, কর সাহায্য তাদের সবল হইতে। ওযুধপত্র নাই যাদের, কর তাদের জন্য দাওয়াইয়ের আর চিকিৎসার ব্যবস্থা। খোল হাসপাতাল, খোল ডিস্পেন্সারি। কর সর্বত্র জঞ্জাল পরিষ্কার, কর পুকুরের পঙ্কোদ্ধার, দে লাগিয়ে জোড়া খালে-বিলে, দে ঝেড়ে ফেলে নোংরামি।' এই গেল শহরের মফস্সলের ছোট-বড় সকল নরনারীর জন্য স্বাস্থ্যোন্নতির পাঁতি। মুচিকে মুচি, মেথরকে মেথর—বিবেকানন্দের পাঁতিতে কেহই বাদ যাইবার নয়। প্রত্যেক গৃহস্থই মুচি-মেথরের স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধান নিজ স্বাস্থ্যোন্নতিরই সঙ্গে সঙ্গে স্বধর্মপালনের অন্তর্গত করিতে শিখিয়াছে।

লোকসেবার আরেকটা বড় কথা—জলদান আর অন্নদান। বিবেকানন্দ বলিতেছে—'দু-বেলা নিজের খাবার তো বেশ জুটিয়াছে দেখিতেছি। এইখানেই শেষ করিলে চলিবে না। পাড়ার লোকগুলা খাইতে পারিতেছে কিনা খুঁজিয়া দ্যাখ। চালা পল্লি-গবেষণা, জেলায় জেলায় আর্থিক অনুসন্ধান। কোন্ কোন্ পরিবারের ঘরে হাঁড়ি চড়িতেছে না, কোন্ কোন্ লোক দু-বেলা আঁচাইবার সুযোগ পায় না, বাহির কর বাড়ি বাড়ি টহল করিয়া, মোলাকাত চালাইয়া। আর সঙ্গে সঙ্গে কর খরচ গরিবদের ভাত-কাপড়ের মাপে ঠেলিয়া তুলিবার জন্য। আর পারিস তো দে তাদের দু-মুঠো ভাত। খোল অন্নসত্র, খোল অনাথ আশ্রম।' এই পাঁতির

ভিতরও আবার বামুন-সেবা, চামার-সেবা, মুদ্দাফরাশ-সেবা সবই সমানভাবে বিরাজ করিতেছে।

লোকসেবার আরেক পাঁতি হইল বিদ্যাদান। বিবেকানন্দ বলিতেছে—'লেখাপড়া তো শিখিয়াছিস দেখিতেছি ভালই। কিন্তু পাড়ার লোকগুলা কি নিরক্ষর থাকিবে? লাগিয়া যা পাঠশালা খুলিতে। দে হররোজ ঘণ্টা খানেক করিয়া মুচির ছেলেমেয়েকে, চাষির ছেলেমেয়েকে, অস্পৃশ্যের ছেলেমেয়েকে, মায় নিরক্ষর বামুন-কায়েত-বৈদ্যের ছেলেমেয়েকে কিছু কিছু লেখাপড়া শিখাইবার জন্য।'

■ খোলা-চোখের মহাপুরুষ ■

বিবেকানন্দী নীতির এইসকল খুঁটা মুহুরিও বুঝে, ব্যাপারীও বুঝে, আদালতের কর্মচারীও বুঝে, উকিল-হাকিমও বুঝে, জমিদারও বুঝে, ইস্কুল-মাস্টারও বুঝে। ''শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'' মন্তর অনুসারে যেকোন লোকই জীবন গড়িয়া তুলিতে রাজি। ''দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী''—এই বয়েতটা বুঝে না সংসারে এমন কোন লোক নাই। তাহা ছাড়া জলদান, অন্নদান, বিদ্যাদান আর ঔষধদানের মারফত নারায়ণকে দরিদ্রের মধ্যে পাকড়াও করিতে পারিলে অথবা দরিদ্রকে ছুঁইয়া ভগবানে পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিলে সকলেরই জীবনে আশার সঞ্চার হয়।

বিবেকানন্দ সংসারের লোককে ডাকিয়া-হাঁকিয়া বলিতেছে—'তুই যেখানে আছিস, সেইখানেই নামজাদা বীর হইতে পারিস। মহাপুরুষ বনিবার জন্য তোর গৃহস্থালি ছাড়িবার দরকার নাই, তোর বনে-জঙ্গলে যাইবার দরকার নাই। চোখ বুজিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান-ধারণায় বসিবার দরকার নাই। খোলা-চোখে, রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতেই, দোকানদারি, উকিলি আর ইস্কুল-মাস্টারি চালাইতে চালাইতেই তুই দেবতা হইতে পারিস।' যে-বিবেকানন্দ চোখ বুজিয়া দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান-ধারণায় অভ্যস্ত—সেই বিবেকানন্দের মুখেই এই বাণী! কাজেই কথাটার দাম লাখ টাকা আর লোকসমাজে ইহার আদর এত বেশি।

বিবেকানন্দ বলিতেছে সজোরে যেখানে-সেখানে আর যখন-তখন—'পালোয়ান হইলে, ভাতকাপড়ে কাহারও গলগ্রহ না থাকিলে, আর কুস্তির আখড়া খুলিলে এবং অন্নসত্র-হাসপাতাল-পাঠশালা ইত্যাদি কায়েম করিলে নরদেবতা হওয়া সম্ভব, বাপ কা বেটা হওয়া সম্ভব, মানুষ হওয়া সম্ভব।' এই কথাটা যে-লোক শুনে, সেই লোকের বুক চওড়া হয় আর আত্মা বাড়িয়া উঠে 'তিন হাত'। তার রক্তের স্রোত ছুটিতে থাকে সবেগে আনন্দে। আর বাস্তবিকপক্ষে বাঙালি জাতির নানা শ্রেণির পুরুষ-নারীকে বিবেকানন্দের বকাবকি 'তিন হাত' চাড়িয়া তুলিয়াছেও। প্রতিদিনকার মামুলি খাওয়া-পরা আর চলাফেরার ভিতরেই মানুষকে ঠেলিয়া তুলিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া বিবেকানন্দ বঙ্গসমাজের অলিতে-গলিতে দিগ্বিজয়ী বীর। মামুলি মানুষকে এইরূপ বাড়তির পথে আনিয়া খাড়া করিবার ক্ষমতায়, সংগ্রামময় জীবনের কর্মক্ষেত্রে ঠেলিয়া তুলিবার ক্ষমতায় বিবেকানন্দের বিশ্বকোষ জগদ্বরেণ্য।

■ দেখা কলা দুনিয়াকে ■

এইখানেই বিবেকানন্দের মানুষ-গড়ার কর্মকৌশল খতম করা সম্ভব। কিন্তু আরো কিছু আছে—বেশ জবররূপেই আছে। বিবেকানন্দী নীতির চতুর্থ খুঁটা হইতেছে—দেখা কলা দুনিয়াকে।

বিবেকানন্দ বলিতেছে—'দ্যাখ কেরানি, দ্যাখ জমিদার, দ্যাখ ইস্কুল-মাস্টার, ঘরবাড়ি-গাছ-পাহাড় সবকিছুর দিকে তাকাবি আর ভাববি যে, দুনিয়াখানাকে গুঁড়া করিয়া ফেলা তোর মরজিরই অধীন। সংসারের যাকিছু দেখিতে পাস সবকিছুর উপরেই তোর কর্তামি রহিয়াছে। সবই তোর পায়ের তলায় অবস্থিত। বাধা আসুক হাজার হাজার, বিঘ্ন আসুক পর্বতপ্রমাণ। সবই তোর ব্যক্তিত্বের নিকট লোপাট হইতে বাধ্য। বল সর্বদা যে, দুনিয়াকে গোলাম করিয়া রাখিবার জন্যই তোর জন্ম। বল যখন-তখন যে, বাধাবিপত্তিগুলাকে পিষিয়া ফেলিয়া অথবা সেইসবগুলাকে কাজে লাগাইয়া তাহার উপর বিজয়ঝাণ্ডা উড়ানোই তো স্বধর্ম।'

বিবেকানন্দের কর্মে ও চিন্তায় যদি কিছু 'আধ্যাত্মিকতা' থাকে তবে তাহা এই 'অহঙ্কারের' ভিতর ঢুঁড়িতে হইবে। অহঙ্কারের এই দম্ভল [দম্ভোলি] যে-জীবনে নাই সেই জীবনে বিবেকানন্দ প্রবেশ করে নাই। অহঙ্কারের এই দম্ভলে যে-জীবন চাঙ্গা হইয়াছে সেই জীবনই বিবেকানন্দের লীলাক্ষেত্র। লোকেরা হয়তো বলিবে—'আরে ভায়া, এই ব্যক্তিত্বনিষ্ঠা, এই পুরুষকার, এই পৌরুষ-প্রতিষ্ঠা, এই আত্ম-গৌরব, এই আত্ম-চৈতন্য, এই আত্ম-কর্তৃত্ব, এই অহঙ্কার—এইসবই যে বেদান্ত!' বিবেকানন্দ বলিবে—'আরে ভাই পদা, আরে ভাই আবদুল, এসব বেদান্ত কিনা জানি না। এইসবই আমি, এইসবই বিবেকানন্দ।' ■